রাষ্ট্র-ব্যবসা আঁতাত : বিদ্যুৎ খাতের লুটপাট এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের 'অলিগারকিক' চেহারা

মাহা মির্জা

ভূমিকা

দীর্ঘ দেড় দশকের সামরিক শাসনের পর নব্বইয়ের শুরুতে বাংলাদেশ নির্বাচনকেন্দ্রিক একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করলেও কাছাকাছি সময়ে বিশ্ব রাজনৈতিক অর্থনীতির পটপরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক ঋণ সংস্থাগুলোর চাপে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে একটি মুনাফাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হতে বাধ্য হয়। এক দিকে ঋণ সংস্থাগুলোর চাপিয়ে দেয়া সংস্কারের আওতায় রাষ্ট্রীয় খাতের ঢালাও বেসরকারীকরণ শুরু হয়, আরেক দিকে পুঁজির ক্রমশ পুঞ্জীভূতকরণের ফলে আবির্ভাব ঘটে প্রভাবশালী ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর। পরবর্তীতে আপাত দৃষ্টিতে আদর্শিকভাবে বিভাজিত দুটি রাজনৈতিক দল পালা করে ক্ষমতায় থাকলেও রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় দুটি রাজনৈতিক সরকারকেই মূলত বৃহৎ ব্যবসায়িক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা গেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত বেসরকারীকরণের প্রথম উদ্যোগ নেয়া হয় ১৯৯৬ সালে। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ সংকট মোকাবেলার অজুহাতে বিকল্প থাকা সত্ত্বেও একের পর এক ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন দেয় সরকার। এই খাতে বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি দেয়ার কারণে গত পাঁচ বছরে ছ'বার বিদ্যুতের দাম বাড়াতে বাধ্য হয় সরকার। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বলা যেতে পারে, বর্তমানে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত একটি নজিরবিহীন অরাজকতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

বলাই বাহুল্য, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোকে সংকুচিত করে ঢালাও বেসরকারীকরণ এবং উদারীকরণের এই নীতি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বাংলাদেশসহ আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় খাতের ঢালাও বেসরকারীকরণের সুযোগেই লুণ্ঠনমূলক পন্থায় রাষ্ট্রীয় সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আশির দশকের শেষ থেকেই।

বৈশ্বিক পটপরিবর্তনের আলোকে রাষ্ট্র ও ব্যবসা

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ইউরোপ তথা পশ্চিমা বিশ্বে কেইনসিয়ান কল্যাণ রাষ্ট্র বা ওয়েলফেয়ারিজমের চর্চা অব্যাহত থাকলেও সত্তর ও আশির দশকে পশ্চিমা বিশ্বের ব্যাংকগুলোতে পেট্রো 'ডলারে'র অবাধ জোগান, তার ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর ঋণ সংকট, দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে ইউরোপ-আমেরিকার 'গোল্ডেন-এরা' নামে পরিচিত কেইনসিয়ান ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে ভাঙতে শুরু করে। আশির দশকে ব্রিটেনসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সেবা খাতের ঢালাও বেসরকারীকরণ এবং কলকারখানাগুলো থেকে ব্যাপক শ্রমিক/কর্মী ছাঁটাই শুরু হলে একসময়কার শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নগুলোও ভেঙে পড়তে থাকে। শ্রমিকশ্রেণি সামষ্টিকভাবেই দুর্বল হয়ে পড়ায় শ্রমিক গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলো অবধারিতভাবেই একসময় গণমানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে শুরু করে।

অন্যদিকে আশির দশকের শেষ থেকে বিশ্বায়ন এবং আন্তর্জাতিক পুঁজির পুঞ্জীভূতকরণ শুরু হলে রাজনীতি এবং রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় পুঁজির মালিক, ব্যবসায়িক শ্রেণি এবং কর্পোরেট লবিংয়ের প্রভাব প্রকট আকার ধারণ করে। এছাড়াও বিশ্বব্যাপী ঋণ সংকটের সুযোগে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়। এদিকে সমাজতন্ত্রী দলগুলো দুর্বল হয়ে পড়ায়, নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারলেও প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজির দাপটে কাঠামোগতভাবে কোনো বড় পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় ঐতিহাসিকভাবে রাজনীতির দুই মেরুতে অবস্থানকারী প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শিক পার্থক্য ক্রমে ঘুচতে থাকে।

সাম্প্রতিক সময়ের ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কলিন ক্রাউচ (২০০৪) ইউরোপের বিভিন্ন দেশের গত দুই দশকের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে ডান ও বাম উভয় রাজনৈতিক দলই ক্ষমতা গ্রহণের পর অব্যাহতভাবে রাষ্ট্রীয় সেবা খাতকে সংকুচিত করে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ঢালাও বেসরকারীকরণ করে বৃহৎ পুঁজির প্রতিনিধিত্ব করতে বাধ্য হয়েছে। ক্রাউচ এই সময়কালকে 'পোস্ট-ডেমোক্রেসি' বা 'উত্তর গণতন্ত্র' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যেখানে গোটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নির্বাচনের মতো কিছু প্রথাগত রীতি-নীতির মধ্যেই আটকে থাকতে হচ্ছে। একটি তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও রাষ্ট্র এবং ব্যবসায়িক শ্রেণির পারস্পরিক যোগসাজশে জনস্বার্থ কিভাবে বিঘ্নিত হয়, এখানে সেই আলোচনাটি করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাজার অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা কতটুকু? রাষ্ট্রের সঙ্গে পুঁজির মালিক বা ব্যবসায়িক শ্রেণির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রটি কতদূর বিস্তৃত? পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র কি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারে? নাকি পুঁজির মালিকের প্রতিনিধিত্ব করতে বাধ্য হয়? একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কেমন হবে, সেই বোঝাপড়ার ক্ষেত্রটি তৈরি করতে এই প্রশ্নগুলো উনিশ শতকের পুঁজিবাদের বিকাশের সময় যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ত্রিশের দশকের 'গ্রেট ডিপ্রেশন' এবং সত্তরের দশকের 'কেইনসিয়ান' প্রেক্ষাপটে। আবার বর্তমানের লাগামছাড়া মুক্তবাজার অর্থনীতির এই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও আগের যে কোনো সময়ের চেয়েই প্রশ্নগুলো বেশি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রের কাঠামোগত বাধ্যবাধকতা বা 'স্ট্রাকচারাল কনস্ট্রেইন্ট'

উনিশ শতকের মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক রোজা লুক্সেমবার্গ থেকে শুরু করে ষাটের দশকের ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রালফ মিলিব্যান্ড, সত্তরের দশকের মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞানী নিকস পৌলান্টযাস, মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী চার্লস লিন্ডব্লম এবং জার্মান মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞানী ক্লাউস অফে অব্যাহতভাবেই বাজার অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা, অবস্থান এবং স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা নিয়ে কাজ করেছেন। সত্তরের মাঝামাঝি থেকে আশির দশকের প্রায় পুরোটাজুড়েই নিকস পৌলান্টযাসসহ যে সকল মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক মার্ক্সবাদের আদলে নীতি-নির্ধারণে রাষ্ট্রের 'কাঠামোগত' বা 'স্ট্রাকচারাল' চরিত্রের প্রভাব নিয়ে কাজ

করেছেন, তাঁদের মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কারণেই রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা অব্যাহতভাবে পুঁজির মালিক বা ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর পক্ষে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়।

'কাঠামোগত বাধ্যবাধকতা'র ব্যাখ্যাটি এরকম : এক দিকে রাষ্ট্রকে টিকে থাকতে বৃহৎ বাণিজ্যিক বিনিয়োগের লভ্যাংশের উপর নির্ভর করতে হয়। আবার আরেক দিকে ব্যবসায়িক শ্রেণির অর্থনীতিতে বিনিয়োগের সক্ষমতা রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ করে দেয়। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিলে পুঁজির মালিক বা ব্যবসায়িক গোষ্ঠী রাতারাতি উৎপাদন কমিয়ে দিতে পারে, কর্মী ছাঁটাই করতে পারে এবং কারখানা বন্ধ করে বিনিয়োগ অন্য দেশে সরিয়ে নিতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় পুঁজি সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হতে পারে এবং বেকারত্ব বেড়ে রাষ্ট্রের কর আদায় প্রক্রিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার কোনো সরকারি নীতি যদি মুনাফা পুঞ্জীভূতকরণ প্রক্রিয়াকে রোধ করে সম্পদের পুনর্বণ্টন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত হয়, সেটাও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকে নিরুৎসাহিত করে। কাজেই দেশের অর্থনীতির গতি শ্লথ হতে পারে এমন কোনো নীতিমালা প্রণয়নের আগে সরকারের নীতিনির্ধারকরা যেমন জাতীয় অর্থনীতির লাভ-ক্ষতির বিষয়টি মাথায় রাখেন, তেমনি নির্বাচনকালীন নিজস্ব লাভ-ক্ষতির বিষয়টিকেও প্রাধান্য দেন। উপরে উল্লিখিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, এই সব কারণেই রাষ্ট্র অব্যাহতভাবে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর চাহিদা জোগানে তৎপর থাকে। অপরদিকে কৃষক-শ্রমিক গোষ্ঠী বা ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করার কোনো সহজ উপায় না থাকায় ব্যবসায়িক শ্রেণি অব্যাহতভাবেই রাষ্ট্রের উপর তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নীতি চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ পায়।

ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধভাবে চাপ প্রয়োগের ক্ষমতা

সত্তরের দশকে পুঁজির মালিক বা ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সামষ্টিক শক্তি ও ক্ষমতার উপর কাজ করেছেন মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ফ্রেড ব্লক। তাঁর 'দ্য রুলিং ক্লাস ডাজ নট রুল' প্রবন্ধে ব্লক (১৯৭৭) পুঁজির মালিকদের সংঘবদ্ধভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারার বিষয়টি তুলে ধরেন।

তবে এর বিপরীতে পোলিশ-আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এডাম সর্জস্কি এবং মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ওয়ালারস্টাইনের (১৯৮৮) বক্তব্য হলো, সরকারি নীতিমালায় প্রভাব খাটানোর ক্ষমতা অর্জনের জন্য পুঁজির মালিকদের সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করা বা রাজনৈতিক প্রভাব থাকাটা অপরিহার্য নয়। সরকারই স্বয়ং নীতি নির্ধারণকালে পুঁজির মালিকের স্বার্থরক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট থাকায় ব্যবসায়িক গোষ্ঠী তদ্বির বা লবিং না করেও এবং রাজনৈতিক প্রভাব না খাটিয়েও সরকারি নীতিমালাকে প্রভাবিত করতে পারে।

একই চিন্তাধারার আভাস পাওয়া যায় জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফিলিপ স্মিটার এবং উলফগাং স্ট্রেকের (১৯৯৯) গবেষণায়। তাঁদের মতে, পুঁজি মালিকদের অর্থনৈতিক

একটি তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও রাষ্ট্র এবং ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মধ্যে উপর্যুপরি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমঝোতা এবং ব্যবসায়ী শ্রেণির প্রতি রাষ্ট্রের অব্যাহত পৃষ্ঠপোষকতার কারণে জনস্বার্থ কিভাবে ক্ষুণ্ন হয়, সেই আলোচনাটি জারি রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এমন নীতি প্রণয়নে জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো যেমন হুমকির মধ্যে পড়তে পারে, সরকার তার রাজনৈতিক সমর্থনও হারাতে পারে। রাজনৈতিক লাভ-লোকসানের হিসাব করেই সরকারে নিয়োগপ্রাপ্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ সরাসরি ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে যুক্ত না থেকেও রাষ্ট্রের নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সব সময় পুঁজি মালিকদের পক্ষে অবস্থান নেয় (স্মিটার ও স্ট্রেক, ১৯৯৯:১২)।

একটি তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও রাষ্ট্র এবং ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মধ্যে উপর্যুপরি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমঝোতা এবং ব্যবসায়ী শ্রেণির প্রতি রাষ্ট্রের অব্যাহত পৃষ্ঠপোষকতার কারণে জনস্বার্থ কিভাবে ক্ষুণ্ন হয়, সেই আলোচনাটি জারি রাখা গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতকে পর্যালোচনা করে দেখার সুযোগ রয়েছে। পরবর্তী অংশে দেশের বিদ্যুৎ খাতের বর্তমান অবস্থার চিত্র এবং এই খাতে রাষ্ট্র ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যে দুর্নীতি ও পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ক বা 'নেক্সাস' তৈরি হয়েছে তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতের লুটপাট এবং রাষ্ট্রের আসল চেহারা : বাংলাদেশ রাষ্ট্র আসলে কার প্রতিনিধিত্ব করে?

আমরা জানি যে বর্তমানে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত একটি অত্যন্ত অরাজক পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যেমন একদিকে বিদ্যুতের উৎপাদন বেড়েছে, অপরদিকে উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির নামে রাষ্ট্রীয় খাতকে ক্রমান্বয়ে পঙ্গু করে বিদ্যুৎ খাতকে যেনতেনভাবে বেসরকারীকরণের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় কুইক রেন্টাল নামক একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও অদক্ষ ব্যবস্থাকে বছরের পর বছর ধরে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে সরকার। দফায় দফায় বিদ্যুতের দাম বাড়ায় সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও লাভবান হয়েছে কুইক রেন্টাল কেন্দ্রগুলোর অনুমোদন পাওয়া কিছু ব্যবসায়িক গোষ্ঠী। এখানে আলোচিত তত্ত্বের আলোকে বিদ্যুৎ খাতের বর্তমান অবস্থাকে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ভিত্তিতে আলোচনাটি হতে পারে।

এক. কুইক রেন্টাল পদ্ধতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান খোঁজা কতটুকু বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত ছিল? রেন্টাল পদ্ধতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাষ্ট্রের উপর আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর চাপ ছিল কি না? সরকারের সামনে অন্য কোনো বিকল্প ছিল কি না?

দুই. কুইক রেন্টাল পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের এই নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক গোষ্ঠী কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে? বিদ্যুৎ খাত বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক গোষ্ঠী সংঘবদ্ধভাবে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করেছে কি না?

তিন. রাষ্ট্র এক্ষেত্রে কতটুকু 'প্রো-অ্যাকটিভ' বা স্বতঃপ্রণোদিত ভূমিকা পালন করেছে? এক্ষেত্রে রাষ্ট্র একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পেরেছে, নাকি বৃহৎ পুঁজির প্রতিনিধিত্ব করতে বাধ্য হয়েছে?

কুইক রেন্টাল পদ্ধতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান খোঁজা কতটুকু বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত ছিল? সরকারের সামনে অন্য কোনো বিকল্প ছিল কি না?

আমরা জানি যে ২০০৯-১০ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের সময় বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ঘাটতি চরম আকার ধারণ করে। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে সে সময় বিদ্যুতের সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল তিন হাজার দুশ মেগাওয়াট (সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রথম রিপোর্ট, ২০১১)। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই অবস্থা থেকে উত্তরণ জরুরি ছিল। কুইক রেন্টাল প্রক্রিয়ায় দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে–এই যুক্তিতে সরকার ক্রমান্বয়ে সর্বমোট ৩২টি ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন দেয়, যার মধ্যে ১৮টিই কুইক রেন্টাল। সরকারের পক্ষ থেকে বার বার যুক্তি দেয়া হয় যে দ্রুতগতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে কুইক রেন্টাল পদ্ধতি ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

এখানে উল্লেখ্য, জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সময়ে অভিমত দিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ প্লান্টগুলো মেরামত ও নবায়ন করলে বিদ্যমান গ্যাসের মাধ্যমেই শতকরা কমপক্ষে আরো ২০ থেকে ৩০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বিডি রহমতুল্লাহ 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট : সমাধান কি অসম্ভব?' প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, বিদ্যুৎসাশ্রয়ী ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করে, শিল্প মালিকদের নিজস্ব ক্যাপটিভ পাওয়ার থেকে অব্যবহৃত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ন্যাশনাল গ্রিডে প্রেরণ করে, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি করে এবং সিস্টেম লস নামিয়ে এনে সঠিক লোড ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সিস্টেম থেকে প্রায় ১৫০০ মেগাওয়াট চাহিদা হ্রাস করা সম্ভব এবং ২৫০০ মেগাওয়াট উৎপাদন বৃদ্ধি করে সিস্টেমে প্রায় ৪০০০ মেগাওয়াট যোগ করা সম্ভব ছিল (রহমতল্লাহ, ২০১১:১৯-২৩)। এছাড়াও দীর্ঘ মেয়াদে রাষ্ট্রীয় খাতে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে স্বাবলম্বী ও শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কথিত গ্যাস সংকট সমাধান সম্ভব বলেও বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সময় মতামত দিয়েছেন।

এক্ষেত্রে আরো লক্ষণীয় যে :

– বর্তমানে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের মাত্র ২০ শতাংশ (১৫০০ মেগাওয়াট) আসে কুইক রেন্টাল কেন্দ্রগুলো থেকে। অথচ বিদ্যুৎ খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই খরচ হচ্ছে এই কেন্দ্রগুলোর পেছনে। আবার এর মধ্যে বেশ কিছু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে উৎপাদন না করেও নিয়মিত বিল নেয়ার অভিযোগ আছে (কালের কণ্ঠ, ১৫ মার্চ ২০১৪)।

– রেন্টাল কেন্দ্রগুলোর ভাড়া বাবদ গত পাঁচ বছরে সরকার এ খাতের ব্যবসায়ীদের দিয়েছে ৯ হাজার কোটি টাকার বেশি (কালের কণ্ঠ, ১৫ মার্চ ২০১৪)। বিশেষজ্ঞদের মতে, একই অর্থ দিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় একটি ১৫০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব ছিল, যা দিয়ে তৎকালীন বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানো যেত (কালের কণ্ঠ, ১৫ মার্চ ২০১৪)।

– ভোক্তা অধিকার সংগঠন কনজ্যুমার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্বালানি উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. এম শামসুল আলমের মতে, কুইক রেন্টাল ও রেন্টাল কেন্দ্র থেকে গ্যাস-বিদ্যুৎ না কিনে সরকারি প্লান্টগুলোকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কাজে লাগানো হলে বছরে ২ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব ছিল (এটিএন টাইমস, ১১ মার্চ ২০১৪)। এতে করে বিদ্যুতের দাম জনগণের নাগালের মধ্যে রাখাও সম্ভব হতো।

অতএব, কুইক রেন্টাল পদ্ধতি ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের আর কোনো উপায় ছিল না– সরকারের এমন যুক্তি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

কুইক রেন্টাল কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে সরকারের উপর আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর চাপ ছিল কি না?

আমরা জানি যে আশির দশক থেকেই আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো কাঠামোগত সংস্কারের আওতায় রাষ্ট্রীয় সেবা খাতগুলোকে সংকুচিত করতে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। তথাকথিত 'সংস্কার' প্যাকেজের অধীনে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ গুরুত্বপূর্ণ সেবা খাতগুলো থেকে রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকুচিত করে এইসব খাতের ঢালাও বেসরকারীকরণকে উৎসাহিত করা হয়। বিশেষ করে কৃষি সেক্টরে সারে ও ডিজেলে ভর্তুকি কমিয়ে আনার ব্যাপারেও সরকারের উপর অব্যাহতভাবে চাপ প্রয়োগ করা হয়। বলাই বাহুল্য, গত দুই দশক ধরে ঋণ সংস্থাগুলোর নানামুখী শর্তাবলির মধ্যে পড়ে সরকারি নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় জনস্বার্থের প্রতিফলনের বদলে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর 'এজেন্ডা'ই বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

আশির দশক থেকেই বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক সংস্কারের নামে রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ খাতকে সংকুচিত করার পরামর্শ দিতে থাকে সরকারকে। সেই প্রেক্ষিতেই ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো বহুজাতিক কোম্পানির বিনিয়োগে আইপিপি (ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার) পদ্ধতির মাধ্যমে বেসরকারিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয় (মুহাম্মদ, ২০১৪:৬৩)। এই শর্তাবলির মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেয়াই ছিল বিশ্বব্যাংকের উদ্দেশ্য, যা পরবর্তীতে সফলও হয়।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে আর্থিকভাবে সফলতার সঙ্গে পরিচালিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB) এবং বিদ্যুৎ বিতরণে নিয়োজিত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিকে (পবিস) ব্যক্তি খাতে ছেড়ে দেবার পরিকল্পনা করে এই প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি ও নৈরাজ্যের সুযোগ করে দেয় বিশ্বব্যাংক। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ সংস্থাগুলোকে উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ ও বিক্রয় অনুযায়ী ভেঙে টুকরো টুকরো করে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এদের দর কষাকষির ক্ষমতাকেও খর্ব করা হয় (রহমতুল্লাহ, ২০১১:১৬, ২৩)।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালে রাষ্ট্রীয় গ্যাসভিত্তিক প্লান্টগুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংকের কাছে অর্থসংস্থানের আবেদন করে বাংলাদেশ সরকার। কিন্তু বছরখানেক পর এই খাতে কোনোরূপ সহায়তা প্রদান করতে তারা অস্বীকৃতি জানায় (মুহাম্মাদ, ইন্টারভিউ, ২০১৪)।

দক্ষতার অভাবের কথা বলে রাষ্ট্রীয় খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করা হলেও পরবর্তীতে বেসরকারি মালিকানার একাধিক অদক্ষ কোম্পানির সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চুক্তির বিষয়ে বিশ্বব্যাংক বা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের পক্ষ থেকেও কোনোরূপ বাধা বা শর্তাবলির সম্মুখীন হতে হয়নি সরকারকে। আরো উল্লেখ্য, কাঠামোগত সংস্কারের আওতায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো থেকে ভর্তুকি কমিয়ে আনার চাপ থাকলেও রেন্টাল কেন্দ্রগুলোর পেছনে বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ভর্তুকির অপচয়ের বিষয়ে দাতা সংস্থাগুলোকে কোনো প্রকার হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যায়নি।

এ থেকে ধারণা করা যায়, কুইক রেন্টাল পদ্ধতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন এই খাতের দীর্ঘমেয়াদি বেসরকারীকরণকেই উৎসাহিত

করে বলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এ বিষয়ে এক ধরনের মৌন সম্মতি জানিয়ে গেছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাগুলো দুই দশক আগে বিদ্যুৎ খাতকে বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দেবার যে আবহ তৈরি করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই বিভিন্ন সরকার তাদের সমর্থিত ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মাধ্যমে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক লাভালাভের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যুৎ খাতে একটি সম্পূর্ণ অ-টেকসই এবং মারাত্মক রকমের ব্যয়বহুল এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস নিয়েছে। তবে পাশাপাশি এও উল্লেখ্য যে, কুইক রেন্টাল পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই উদ্যোগ কোনো ঋণ সংস্থার সরাসরি পরামর্শে হয়নি। বরং কুইক রেন্টালের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ধারণা, রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী মহল থেকেই প্রথম প্রস্তাব করা হয়। এবং এটিও পরিষ্কার যে, রাষ্ট্র নিজেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিশেষ আইন করে কুইক রেন্টাল ব্যবস্থাকে দীর্ঘ মেয়াদে চালু রাখার বন্দোবস্ত করেছে।

কুইক রেন্টাল পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের এই নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক গোষ্ঠী কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে? বিদ্যুৎ খাত বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক গোষ্ঠী সংঘবদ্ধভাবে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করেছে কি না?

নীতি আগে প্রণীত হলেও বিদ্যুৎ খাতকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেবার প্রয়াস প্রথম শুরু হয় ২০০৩ সালে, তৎকালীন বিএনপি সরকারের সময় (রহমতুল্লাহ, ইন্টারভিউ, ২০১৪)। ২০০৪ সালে গঠিত প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক কমিটির সদস্য সচিব এবং পাওয়ার সেলের প্রাক্তন মহাপরিচালক বিডি রহমতুল্লাহর ভাষ্য মতে, তৎকালীন সচিব এ. এন. এইচ. আখতার হোসেন (যিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর আস্থাভাজন ছিলেন) আমলাতান্ত্রিক জটিলতার দোহাই দিয়ে এবং রাষ্ট্রীয় খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন সময়সাপেক্ষ– এই যুক্তিতে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জোর তদ্বির শুরু করেন। বিডি রহমতুল্লাহর ভাষ্য মতে, ওই সময় বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে সকল 'ক্রাইটেরিয়া' বা মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়, তার মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অভিজ্ঞতাকে আমলে নেয়া হয়নি। বরং বেছে বেছে তৎকালীন সরকারের সংসদ সদস্যদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিদ্যুৎ খাতকে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেবার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে ১০টি কুইক রেন্টালের পরিকল্পনা করা হলেও পরবর্তীতে এ বিষয়ে তৎকালীন সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্যে বিপুল আগ্রহের সৃষ্টি হলে ১০ মেগাওয়াটের মোট ৫০টি ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয় (পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এই পরিকল্পনা বাতিল করে শুধুমাত্র তিনটি কুইক রেন্টালের অনুমোদন দেয়া হয় (রহমতুল্লাহ, ইন্টারভিউ, ২০১৪)। কিন্তু পরবর্তীতে এরই ধারাবাহিকতায় আমরা আওয়ামী লীগ সরকারকে মোট ৩২টি রেন্টাল কেন্দ্রের অনুমোদন দিতে দেখেছি, যার মধ্যে প্রায় ১১টি রেন্টাল কেন্দ্রের মেয়াদ বাড়িয়েছে সরকার।

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, সম্প্রতি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক এম শামসুল আলম অভিযোগ করেন, মালিকের স্বার্থে ও চাপেই সরকার কুইক ও রেন্টাল প্লান্টের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ ২০২০ সাল পর্যন্ত বাড়াচ্ছে (এটিএন টাইমস, ১১ মার্চ ২০১৪)।

এখানে উল্লেখ্য, এ বছরের মার্চ মাসে সংসদ অধিবেশন চলাকালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কাছে সাংসদ বাহাউদ্দিন নাছিম জানতে চান, রেন্টাল, কুইক রেন্টালের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা হবে কি না। জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "রেন্টাল, কুইক রেন্টাল নিয়ে এত কথা... কালকেই বন্ধ করে দিই?... আসলে কেউ ব্যবসা চেয়েছেন, পাননি। সেজন্যই এত দুঃখ, এত ব্যথা" (প্রথম আলো, ১৯ মার্চ ২০১৪)। বলাই বাহুল্য, প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যে দলীয় সাংসদদের রেন্টাল কেন্দ্রের 'ব্যবসা' চাওয়ার ইঙ্গিতটি স্পষ্ট।

এছাড়াও সাংসদদের ব্যক্তিগতভাবে 'ব্যবসা চাওয়ার' বিষয়টি থেকে এও ধারণা করা যায় যে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ লবিং নয়, বরং নিজস্ব অর্থ উপার্জন এবং লাভালাভের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েই ব্যবসায়িক গ্রুপগুলো সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেছে।

এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সঙ্গে পুঁজির মালিক বা ব্যবসায়িক শ্রেণির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রটি কতদূর বিস্তৃত?

এবার দেখা যাক, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কাদের সঙ্গে করা হয়েছে কুইক রেন্টালের চুক্তি। এবং কুইক রেন্টাল কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে চুক্তি করার ক্ষেত্রে কোন যোগ্যতা বা ক্রাইটেরিয়াগুলো প্রাধান্য পেয়েছে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজলেই দেখা যাবে, সরকার যে সমস্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তার অনেকগুলোই সরকার সমর্থিত বা সরকারি দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যেমন বিমানমন্ত্রী ফারুক খানের পারিবারিক প্রতিষ্ঠান সামিট গ্রুপ প্রায় ২০০০ মেগাওয়াটের ৬টি ছোটবড় বিদ্যুৎকেন্দ্র পেয়েছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন পেয়েছে সরকার সমর্থিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শিকদার গ্রুপের পাওয়ার প্যাক হোল্ডিংস। আরো অনুমোদন পেয়েছে রাজশাহী-৪ আসনের আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য এনামুল হকের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নর্দার্ন পাওয়ার সলিউশন লিমিটেড। এছাড়া বিদেশি প্রতিষ্ঠান আইসোল্যাকস স্যামসাং সিদ্ধিরগঞ্জে ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের দায়িত্ব পায়। এই প্রতিষ্ঠানটির স্থানীয় প্রতিনিধি সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী আবুল হোসেনের প্রতিষ্ঠান সাকো ইন্টারন্যাশনাল। বলাই বাহুল্য, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোনোটিরও বিদ্যুৎ উৎপাদনের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও দলীয় বিচারেই চুক্তিগুলো হয়েছে তা পরিষ্কার। এছাড়া ১০০ মেগাওয়াটের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের দায়িত্ব পেয়েছে দেশ এনার্জি লিমিটেড। এই প্রতিষ্ঠানটির মালিক শিল্পপতি আনিসুল হকের সঙ্গে সরকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ করা যায়।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি দৈনিক প্রথম আলোর একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, রাজশাহী-৪ আসনের সাংসদ এনামুল হকের বিরুদ্ধে সম্পদের তথ্য গোপন এবং জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ তদন্ত করছে দুদক। উল্লিখিত সাংসদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্জিত আয় সাংসদের নিজস্ব আয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করায় দুদক কর্মকর্তাকে হুমকি দেয়া হয়েছে বলেও উক্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায় (প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪)। এই ঘটনা থেকে সরকার দলীয় এই সাংসদের কুইক রেন্টালসহ অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এবার দেখা যাক, রেন্টাল কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্র কতটুকু

রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা এবং ব্যবস্থাপনাকারীর তালিকা

বিদ্যুৎকেন্দ্রের অবস্থান	*উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)*	*ব্যবস্থাপনাকারী কোম্পানি/মালিক*
ঘোড়াশাল	১৪৫	এগরেকো ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট লিমিটেড (এশিয়া)
খুলনা	৫৫	এগরেকো ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট লিমিটেড (এশিয়া)
খুলনা	১১৫	খুলনা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (সামিট সেন্টার)
মদনগঞ্জ	১০২	সামিট নারায়ণগঞ্জ পাওয়ার লিমিটেড
মেঘনাঘাট	১০০	এম/এস আইইএল কনসোর্টিয়াম অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড
সিদ্ধিরগঞ্জ	১০০	ডাচ্-বাংলা পাওয়ার অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট লিমিটেড
পাগলা	৫০	ডিপিএ পাওয়ার জেনারেশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
সিদ্ধিরগঞ্জ	১০০	দেশ এনার্জি লিমিটেড
কেরানীগঞ্জ	১০০	পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা, কেরানীগঞ্জ পাওয়ার প্লান্ট লিমিটেড
জালদা	১০০	চিটাগং একর্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিসেস লিমিটেড
আমনুরা	৫০	জেভি অব সিনহা পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড
কাটাখালী	৫০	রাজশাহী নর্দার্ন পাওয়ার সলিউশন লিমিটেড
নোয়াপাড়া	৪০	খুলনা এম/এস খানজাহান আলী পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড
ঘোড়াশাল	৭৮.৫ (গ্যাসভিত্তিক)	ম্যাক্স পাওয়ার লিমিটেড
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭০ (গ্যাসভিত্তিক)	এগরেকো ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট লিমিটেড (এশিয়া)
আশুগঞ্জ	৮০ (গ্যাসভিত্তিক)	এগরেকো ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট লিমিটেড (এশিয়া)
আশুগঞ্জ	৫৩	ইউনাইটেড আশুগঞ্জ পাওয়ার লিমিটেড
মেঘনা ঘাট	১০০	এম/এস হায়পারিওন পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড

প্রো-অ্যাকটিভ বা স্বতঃপ্রণোদিত ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পেরেছে, নাকি বৃহৎ পুঁজির প্রতিনিধিত্ব করতে বাধ্য হয়েছে?

সরকার থেকে কী কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে রেন্টাল কেন্দ্রের মালিকরা?

জমি : চুক্তি অনুযায়ী ভূমি ক্রয়, উন্নয়ন বাবদ ব্যয় এবং জ্বালানি সরবরাহের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ বাবদ ব্যয় রেন্টাল কেন্দ্রগুলোকে বহন করতে হবে না। অর্থাৎ রেন্টাল কেন্দ্রগুলো স্থাপনের জন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় জমি সরবরাহ করেছে সরকার।

রেন্টাল কেন্দ্রের ভাড়া : রেন্টাল কেন্দ্রগুলোর ভাড়াও মেটাচ্ছে সরকার। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কেন্দ্রগুলোর ভাড়া বাবদ গত পাঁচ বছরে সরকার এ খাতের ব্যবসায়ীদের দিয়েছে ৯ হাজার কোটি টাকার বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিপুল পরিমাণ অর্থে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় একটি ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি সম্ভব ছিল (রহমতুল্লাহ, ইন্টারভিউ, ২০১৪)।

তিন ধাপে রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি

আমরা জানি বিদ্যুৎকেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় অর্থে জ্বালানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এই ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে তিন ধাপে–

জ্বালানি ক্রয়ে ভর্তুকি : সরকার আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রতি লিটার ডিজেল ৭৩.০০ টাকা এবং প্রতি লিটার ফার্নেস অয়েল ৬৯.০০ টাকা দরে কিনে রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল কেন্দ্রগুলোর কাছে অব্যাহতভাবে যথাক্রমে লিটারপ্রতি ৬১.০০ ও ৬০.০০ টাকা দরে বিক্রি করছে। অর্থাৎ সরকারকে প্রতি লিটার ডিজেল ও ফার্নেস অয়েলে ভর্তুকি বাবদ দিতে হচ্ছে যথাক্রমে (৭৩.০০-৬১.০০)= ১২.০০ টাকা ও (৬৯.০০-৬০.০০)= ৯.০০ টাকা, যার গড় দাঁড়ায় ১১.০০ টাকা (রহমতুল্লাহ, ইন্টারভিউ, ২০১৪)।

এছাড়াও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দেখা যায়, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যবহৃত জ্বালানি 'সাবসিডি' রেটে সরবরাহ করা হয় বলে রেন্টাল কেন্দ্রগুলো নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ অপচয় করছে। উল্লেখ্য যে, জ্বালানির হিসাব গরমিল করে ভর্তুকির জ্বালানি বাজারে বেশি দামে বিক্রি করার অভিযোগও পাওয়া যায় রেন্টাল কেন্দ্রগুলোর বিরুদ্ধে।

অধিক দামে বিদ্যুৎ ক্রয় : উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক বেশি দাম দিয়ে রেন্টালে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে। যেমন–একটি পুরনো ডিজেলভিত্তিক রেন্টাল কেন্দ্রের বিবেচনায় হিসাব করলে সাধারণভাবে বিদ্যুতের ট্যারিফ হওয়ার কথা ৮.০০ টাকা। সেখানে সরকার কর্তৃক রেন্টাল কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ বিল বাবদ ট্যারিফ ধরা হয়েছে ১৪.৮০ টাকা। পুরনো ফার্নেসভিত্তিক রেন্টাল কেন্দ্রের বিবেচনায় ট্যারিফ দাঁড়ায় ৬.৬০ টাকা, যেখানে ট্যারিফ ধরা হয়েছে ৮.৮০ টাকা। অর্থাৎ ডিজেলের ক্ষেত্রে রেন্টাল কেন্দ্রগুলো থেকে সরকারকে অতিরিক্ত দিতে হচ্ছে (১৪.৮০-৮.০০)= ৬.৪০ টাকা আর ফার্নেসের ক্ষেত্রে সরকারকে দিতে হচ্ছে (৮.৮০-৬.৬০)= ২.২০ টাকা। এক্ষেত্রে হিসাবের সুবিধার জন্য গড়ে ৭.০০ টাকা ভর্তুকি এবং ৬০% প্লান্ট ফ্যাক্টর ধরলে ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি বাবদ সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে প্রায় ৮,০০০ কোটি টাকা (রহমতুল্লাহ, ইন্টারভিউ, ২০১৪)।

লোকসানে বিক্রি : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল কেন্দ্রগুলোর কাছ থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ১৪.৮০ টাকা দরে কিনলেও ডেসা, ডেসকো ইত্যাদি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যুৎ বিক্রি করছে গড়ে ৭.৮০ টাকায়। এতে বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতি দাঁড়াচ্ছে বার্ষিক ৮০০০ কোটি টাকা। এই তিন ধরনের ভর্তুকি দিতে সরকারকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ব্যয় করতে হচ্ছে প্রায় ২৮,০০০ কোটি টাকা (রহমতুল্লাহ, ইন্টারভিউ, ২০১৪)। স্বভাবতই এই বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি রাষ্ট্রীয় কোষাগারের উপর ভয়ংকর চাপ সৃষ্টি করছে। এইসব খরচ জোগাতেই আওয়ামী লীগ সরকার গত পাঁচ বছরে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে ছয়বার।

দায়মুক্তি আইন

২০১০ সালে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার দোহাই দিয়ে প্রচলিত আইনের অধীন দরপত্র প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে দুই বছরের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন প্রণয়ন করে আওয়ামী লীগ সরকার। এই দায়মুক্তি

আইনের মাধ্যমে সরকার টেন্ডার ছাড়াই যে কোনো দরে, যে কাউকে বিদ্যুৎ তৈরির লাইসেন্স দিয়েছে। এছাড়াও এই আইনের মাধ্যমে আদালতের এখতিয়ার রহিত করা হয়, যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সব ধরনের আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থাও রহিত হয়।

পরবর্তীতে এই আইনটির মেয়াদ আরো দুই বছর বাড়ানো হয়। এবং অতি সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় এই আইনটির মেয়াদ চার বছর শেষে আরো চার বছর বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে কয়েক দফায় প্রায় ১১টি রেন্টাল কেন্দ্রের মেয়াদ বেড়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, বিশেষ পরিস্থিতিতে গৃহীত এই আইনটি দীর্ঘদিন বহাল রাখার মাধ্যমেই কোনো রকমের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও দলীয় বিবেচনায় রেন্টাল কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দেয়া সম্ভব হয়েছে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ২০০৮ সালে পাকিস্তান পিপলস পার্টির সরকার রেন্টাল পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নিলে ২০১১ সালে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রেন্টাল পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। বলাই বাহুল্য, পাকিস্তানে কুইক রেন্টাল পদ্ধতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো একটি লুণ্ঠনমূলক ব্যবস্থাকে বেশিদিন চলতে দেয়া হয়নি। অথচ বাংলাদেশে এ ব্যবস্থাকে প্রায় স্থায়ীকরণের দিকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন বক্তব্যে ২০২০ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থাকে জারি রাখার আভাসও পাওয়া গেছে।

সরকার-সাংসদ-আমলা-রাজনৈতিক নেতা-ব্যবসায়ী নেক্সাস–রাষ্ট্রযন্ত্র কোন প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়িক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে?

সরকারে আসীন কর্তাব্যক্তিরা যখন রাজনৈতিক দলের সাংসদদের ব্যবসা 'পাইয়ে দেয়া' বা তাঁদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাভবান করার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকেন, তখন রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত আমলাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে নিচের পর্যবেক্ষণগুলো প্রাসঙ্গিক–

এক. গত এক দশকে আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে রাজনৈতিক ও দলীয় বিবেচনায় অযোগ্য ব্যক্তিদের পোস্টিং দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিদ্যুৎ বিভাগে কাজ করার কোনো রকমের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকার পরও বিগত বিএনপি সরকারের আমলে পাওয়ার ডিভিশনের সেক্রেটারি পদের দায়িত্ব পান সচিব এ. এন. এইচ. আখতার হোসেইন। ২০০৪ সালে গঠিত প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক কমিটির 'জেনারেল সেক্রেটারি' পদেও নিয়োগপ্রাপ্ত হন তিনি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ থাকার সুবাদে তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক কমিটির বিভিন্ন সভায় রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বিষয়ে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পান।

দুই. বর্তমানে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী না থাকায়, এবং এই মন্ত্রণালয়টি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থাকায়, এই মন্ত্রণালয়ের সম্পূর্ণ নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়াটিই 'সেন্ট্রালাইজড' বা কেন্দ্রীভূত। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় নীতিমালা প্রণয়নে আমলাতন্ত্রের প্রভাব সীমিত এবং নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় জনস্বার্থ প্রতিফলিত হবার সুযোগ নেই।

২০১০ সালে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার দোহাই দিয়ে প্রচলিত আইনের অধীন দরপত্র প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে দুই বছরের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন প্রণয়ন করে আওয়ামী লীগ সরকার। এই দায়মুক্তি আইনের মাধ্যমে সরকার টেন্ডার ছাড়াই যে কোনো দরে, যে কাউকে বিদ্যুৎ তৈরির লাইসেন্স দিয়েছে। এছাড়াও এই আইনের মাধ্যমে আদালতের এখতিয়ার রহিত করা হয়, যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সব ধরনের আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থাও রহিত হয়।

তিন. গত কয়েক দশকে নির্বাচনের ব্যয়ভার বেড়ে যাওয়ায় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বিভিন্ন রকমের 'পুনর্বাসনমূলক' তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যায়। নিজ দলের নেতা, কর্মী ও সাংসদদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যবসায়িকভাবে লাভবান করার এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের 'টোকেন অফ পার্মানেন্সি' নামে পরিচিত আমলাতন্ত্রের সদস্যগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিশ্চুপ থাকতে বাধ্য হন অথবা নিজেরাই এই প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে পড়েন। সচিব আখতার হোসেইন আমলা-সাংসদ নেক্সাসের একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ।

পরিশেষ

বিদ্যুৎ খাত বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক গোষ্ঠী সংঘবদ্ধভাবে সরকারের বিভিন্ন স্তরে লবিং বা চাপ প্রয়োগ করেছিল কি না, কী প্রক্রিয়ায় এই লবিং হয়েছে এবং এতে দুই পক্ষের অর্থনৈতিক লেনদেন হয়েছে কি না, তা অনুসন্ধানের বিষয়। তবে উপরের আলোচনা থেকে ধারণা করা যেতে পারে, কুইক রেন্টালের পক্ষে সংঘবদ্ধ লবিং নয়, বরং নিজস্ব ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দ্বিপাক্ষিকভাবেই সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সমঝোতা হয়েছে।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাসমূহ কুইক রেন্টালের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সরকারের উপর সরাসরি চাপ প্রয়োগ না করলেও দুই দশক ধরে বিদ্যুৎ খাতের এই যেনতেন বেসরকারীকরণের প্রেক্ষাপটটি তৈরি হয়েছে তাদেরই হাতে। এখানে উল্লেখ্য যে, উপরে আলোচিত কাঠামোগত বাধ্যবাধ্যকতার তত্ত্ব অনুযায়ী সরকারের কোনো নীতিমালায় ব্যবসায়িক গোষ্ঠী নিরুৎসাহিত হলে জাতীয় অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে। অথচ বিদ্যুৎ খাতে আমরা দেখছি সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতি। সরকার কুইক রেন্টালের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত না নিলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোনো রকমের পূর্ব অভিজ্ঞতাবিহীন ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর পক্ষে 'বিনিয়োগ সরিয়ে', 'উৎপাদন কমিয়ে', বা 'কর্মী ছাঁটাই' করে সরকারের সঙ্গে দর কষাকষি করার মতো অর্থনৈতিক সক্ষমতা ছিল কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ। অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পূর্ব অভিজ্ঞতাবিহীন ব্যবসায়িক শ্রেণি দর কষাকষির মাধ্যমে সরকারকে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিকভাবে বিপদে ফেলতে পারত–এমন আশঙ্কাও ভিত্তিহীন। অর্থাৎ কুইক রেন্টালের ক্ষেত্রে কাঠামোগত কারণে বা দাতাদের চাপে জাতীয় অর্থনীতির প্রশ্নে সরকার আপোস করতে বাধ্য হয়েছে–এমন দাবি করার অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে বরং রেন্টালের মতো একটি

মারাত্মক ব্যয়বহুল প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমেই জাতীয় অর্থনীতিকে ভয়াবহ ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় যে, সরকার স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই বিদ্যুৎ উৎপাদনের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও এমন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করেছে, যারা সরকার সমর্থিত বা সরকার দলীয় হিসেবে পরিচিত কিংবা আকর্ষণীয় আর্থিক সুবিধা/কমিশন/ঘুষ দিতে সম্মত। এক্ষেত্রে সরকারে কর্মরত সদস্যরাই বিভিন্ন ব্যবসায়িক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত থাকায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই ব্যবসায়িক গোষ্ঠীদের প্রতিনিধিত্ব করেছে তারা। এক্ষেত্রে দুই পক্ষের মধ্যে অর্থনৈতিক লেনদেনের বিষয়টি কোনভাবেই উড়িয়ে দেয়া যায় না।

এ থেকে বোঝা যায়, রাষ্ট্র যে কেবল ব্যবসায়িক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছে তা-ই নয়, বরং বিদ্যুৎ সংকটের অজুহাতে রাষ্ট্রযন্ত্র, রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে কর্মরত ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ, সরকারে থাকা রাজনৈতিক দল (যারা একাধারে জনগণের প্রতিনিধি), তাদের অনুসারী, আত্মীয়স্বজন এবং আংশিকভাবে এদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায়িক গোষ্ঠী একত্রে সামষ্টিকভাবেই রাষ্ট্রীয় এই খাতের ঢালাও বেসরকারীকরণের সুযোগে বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ভর্তুকির সুবিধা নিয়ে একটি লুণ্ঠনমূলক ব্যবস্থা কায়েম করেছে। বলা যেতে পারে, রাষ্ট্র ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর এই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক যোগাযোগ, লেনদেন, মধ্যস্থতা বা সমঝোতা তথা রাষ্ট্র ও ব্যবসার এই লুণ্ঠনমূলক আঁতাতের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ক্রমশ 'গোষ্ঠীতান্ত্রিক' বা 'অলিগারকিক' হয়ে ওঠা চরিত্রটিই প্রকাশ পাচ্ছে। রাষ্ট্রের এই ক্রমে 'অলিগারকিক' হয়ে ওঠার পেছনের ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটি ভবিষ্যতে আরো বিশদভাবে আলোচনার দাবি রাখে।

মাহা মির্জা: পি.এইচ.ডি গবেষক
ইমেইল: maha.z.mirza@gmail.com

তথ্যসূত্র :

১. Block, Fred. "The Ruling Class Does Not Rule", Socialist Revolution33, (1977): 628.

২. Crouch, Colin. Post Democracy. Cambridge: Polity Press, 2004.

৩. Lindblom. Charles E. Politics and Markets: The World's Political-Economic Systems. New York: Basic Books, 1977.

৪. Lindblom, Charles E. The Market System: What it is, how it works, and what to make of it, Yale University Press, 2001.

৫. Miliband, Ralph. The State in Capitalist Society, New York: Basic Books, 1969.

৬. Muhammad, Anu. "Natural Resources and Energy Security, Challenging the Resource-Curse Model in Bangladesh". Economic & Political Weekly, vol xlix no 4. January 25, 2014.

৭. Offe, Claus. "Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe", Social Research 58, No. 4 (1991): 865-892.

৮. Przeworski, A. and M. Wallerstein. "Structural Dependence of the State on Capital", American Political Science Review 82 (1988): 11–29.

৯. Rahmatullah, B.D. Interview with B. D. Rahmatullah. Personal Interview. Dhaka, August 12, 2014.

১০. Schmitter, Philippe C. and Wolfgang Streeck. "The Organization of Business Interest: Studzing the associative Action of Business in Advanced Industrial Societies", MPIFG Discussion paper 99/1 March 1999.

১১. Wallerstein, Michael. "Structural Dependence of the State on Capital". In Selected Works of Michael Wallerstein: The Political Economy of Inequality, Union and Social Democracy, edited by David Austen Smith, Jeffry A. Frieden, Miriam A. Golden, Karl Ove Moene, and Adam Przeworski. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

১২. এটিএন টাইমস, কুইক রেন্টালে ২০০০ কোটি টাকা গচ্চা : ক্যাব, ১১ মার্চ ২০১৪, Retrieved from http://www.atntimes.com/archives/95085

১৩. কুইক রেন্টাল নিয়ে এত কথা, কালকেই বন্ধ করে দিই? প্রথম আলো, ১৯ মার্চ ২০১৪।

১৪. সরকারের টাকায় কেন্দ্র, মালিকানা ব্যবসায়ীদের, আরিফুজ্জামান তুহিন, কালের কণ্ঠ, ১৫ মার্চ ২০১৪।

১৫. দুদক কর্মকর্তাকে হাওয়া করে দেয়ার হুমকি, প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

১৬. নবম জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রথম রিপোর্ট, আগস্ট ২০১১

১৭. মুহাম্মদ, আনু। ইন্টারভিউ, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

১৮. রহমতুল্লাহ, বি. ডি., বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট : সমাধান কি অসম্ভব? সংহতি প্রকাশনী, ২০১১,

১৯. রহমতুল্লাহ, বি. ডি., বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের সংকট, লুটপাট, বিকল্প জ্বালানিশক্তির অপার সম্ভাবনা, বিবিধ, আগস্ট ২০১৩।

২০. রহমতুল্লাহ, বি. ডি., কুইক রেন্টাল : ২০ সাল পর্যন্ত ক্ষতি ২ লাখ কোটি টাকা (দ্বিতীয় পর্ব) : আমাদের বুধবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, Retrieved from http://www.amaderbudhbar.com/?p=3152